পরিবর্তনের অনুসংগঠকরা
এবং অহিংস কার্যকলাপ

পরিবর্তনের অনুসংগঠকরা এবং অহিংস কার্যকলাপ*

আম-জনগণের কাছে তাদের অধিকার, স্বাধীনতা আর ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করার একটি উপায় হল অহিংস কার্যকলাপ। এটি সচরাচর নৈতিকতা-নির্ভর বা নীতিগত অহিংসার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এখানে আমি এটিকে সব ধরনের নৈতিকতা বা নীতির বনিয়াদ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র পরিঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করব, যাতে কোনো একটি সংঘাতের ক্ষেত্রে এটি কী-ভাবে চাপ দিয়ে সুবিধা আদায়ের একটি বাস্তবধর্মী উপায় হিসেবে কাজ করে সেটা আমি বিশদ ভাবে রাখতে পারি।

অহিংস কার্যকলাপ যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ওপর ভিত্তি করে আছে তা হল, কোনো একটি সমাজে জনগণের সম্মতি আর আনুগত্য থেকে অবশেষে ক্ষমতা জন্ম নেয়। আবার উলটো দিকে দেখলে, প্রচলিত অভিমতটি হল যে, কোনো একটি সমাজে সহজাত ভাবে তারাই ক্ষমতার ভিত্তি যারা সম্পদকে এবং হিংসা প্রয়োগের সব চেয়ে বেশি সামর্থ্যকে সংহত করেছে। তবে অর্থনীতি ঠিক যেমন জীবজগতের একটি অনুষঙ্গ ব্যবস্থা এবং সে-কারণে এটি অবশেষে জীবজগতের নিয়মগুলি দিয়ে পরিচালিত হয়, ঠিক তেমন ভাবেই, ক্ষমতা-ব্যবস্থাগুলি আপাতদৃষ্টিতে হিংসা আর অর্থের উপর ভিত্তি করে আছে মনে হলেও এগুলি আসলে হল হাজারো বা লাখো জনগণের আরও খোলামেলা আচরণ এবং আনুগত্যের ধাঁচগুলির অনুষঙ্গ ব্যবস্থা। ওই জনগণ যদি তাদের বিশ্বস্ততা, আচরণ ও আনুগত্য বদলে ফেলে, তা হলে একটি সমাজে তথা বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যও বদলে যায়। সহজ কথায় বললে, জনগণ যদি না মানে, তা হলে কোনো শাসক বা সংস্থাই শাসন চালাতে পারে না।

কাজেই অহিংস কার্যকলাপ একটি যৌথ তলে জনগণের বিশ্বস্ততা, আচরণ এবং আনুগত্যের ধাঁচগুলিতে বদল ঘটিয়ে ক্ষমতা হাতে নিয়ে ব্যবহার করে। এটি বেশ নাটকীয় ভাবেও ঘটতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেমন এটা ঘটেছিল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলনে, বিভিন্ন শ্রমিক সংগ্রামে (যেমন ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের শেষ ভাগে ইউনাইটেড ফার্ম ওয়ার্কার্স আন্দোলন), এবং ফার্দিনান্দ মার্কোস (১৯৮৬), অগাস্তো পিনোচেত (১৯৮৮), দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য (১৯৮০-৯০ নাগাদ), শ্লোবোদান মিলোশেভিচ (২০০০) এবং ইউক্রেনের কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা (২০০৪) অবসানের সময়গুলিতে। আবার, বদলগুলি আরও সূক্ষ্ম ভাবেও ঘটতে পারে। যেমন, জনগণ যখন স্থানীয় মালিকানাধীন ব্যাবসাগুলি থেকে কেনাকাটা করাকে বেছে নেয়, কোনো পণ্য বর্জন করে, কিংবা বিকল্প প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজ করে। অহিংস কার্যকলাপের অসংখ্য পদ্ধতি আর বহিঃপ্রকাশ থাকলেও, এর সবগুলিকে নিচের তিনটি বর্গের কোনো একটিতে ফেলা যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে নিযুক্ত থাকার কাজ — অর্থাৎ, জনগণ এমন কিছু করে বসে যেগুলি তাদের কাছে আশা করা হয়নি, তারা করবে ভাবা যায়নি বা তাদের করার অনুমতি দেওয়া হয়নি; আর একটি হচ্ছে বিযুক্ত থাকার কাজ — অর্থাৎ, জনগণ সে-সব কিছুই করে না যেগুলি তাদের কাছে আশা করা হয়েছে, তারা করবে ভাবা হয়েছে বা তাদের কর্তব্য বলে দাবি করা হয়েছে; সর্বশেষটি হচ্ছে নিযুক্ত থাকা এবং বিযুক্ত থাকার সংমিশ্রণ।[1]

জনগণের আনুগত্য আর আচরণের ধাঁচগুলির বদলকে উৎসাহিত করতে, জনগণ কেন শুরুতে আনুগত্য দেখায় এবং সেই মোতাবেক আচরণ করে সেটা গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে। এর কারণগুলি একেক সমাজে হবে একেক রকম। তবে সারা বিশ্বের বিভিন্ন সক্রিয়-কর্মী ও সংগঠকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আনুগত্যের অন্যতম যে দুটি কারণের মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে সেগুলি হল, জনগণ মনে করে এই আচরণের বিকল্প আর কিছু নেই, এবং তাদের কার্যকলাপ যে একটা ফারাক গড়ে দিতে পারে সে-ব্যাপারে তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব। জনগণের অনেকেই ভুলে গেছে যে, তাদের সমাজের সত্যিকারের ক্ষমতাধর আসলে তারা নিজেরাই। নিঃসন্দেহে সব বিধিসম্মত শিক্ষা, নিগম, সরকার এবং প্রচার-মাধ্যমগুলি মিলে যে

[1] জিন শার্প, *ওয়েজিং ননভায়োলেন্ট স্ট্রাগল: টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি প্র্যাকটিস অ্যান্ড টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি পোটেন্সিয়াল*, (বস্টন, ম্যাসাচুশেটস: পোর্টার সারজেন্ট পাবলিশার্স), ২০০৫, পৃ. ৫৪৭।

আখ্যানটিকে জোরদার করে সেটা হল এই যে, ক্ষমতার দখলদারি রয়েছে সরকারি ভবন বা নিগম সদর দপ্তরের গুটি-কয়েক ব্যক্তির মধ্যেই, এবং অর্থ ও বন্দুকই (যেগুলির উপর তাদের একচেটিয়া রয়েছে) হচ্ছে শক্তির চূড়ান্ত উৎস। এ-সব আখ্যান বেশ ভালো ভাবেই ওদের সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খায়। অবশ্য ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকেই সফল অহিংস আন্দোলনগুলি জনগণকে যে প্রকৃত সত্যটিতে অনুপ্রাণিত করেছে তা হল, নিজেদের যৌথ কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে জনগণের যে অংশ একটি সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘিরে সংগঠিত এবং সামগ্রিক-কৌশলগত ভাবে সক্রিয় আছে, তারা সেনাবাহিনী ও অর্থের চেয়েও অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী। সাম্প্রতিক কালে তৃণমূল স্তরের যে আন্দোলনই গুরুত্ব পেতে চাইছে, তাকে এই প্রকৃত সত্যটি মনে রাখতে হবে এবং জনগণকেও মনে করিয়ে দিতে হবে যে তারাই তার বাগ্‌বিস্তারের ক্ষমতাশালী এক কেন্দ্রীয় লক্ষ্যবস্তু।

এটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, সফল আন্দোলনগুলি জনগণকে শুধু এটাই বলে না যে তারা ক্ষমতাশালী, তারা জনগণের চোখের সামনে স্পষ্ট, অর্জনযোগ্য অভিলক্ষ্যগুলিকে স্থির করে জনগণের ক্ষমতার প্রদর্শনও করে। আর তার পর, তাদের বিজয়গুলির প্রামাণ্য দলিল তৈরি করে ও প্রচার চালায়। হতে পারে যে এই বিজয়গুলির নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু জনগণকে সমাবেশিত করার ক্ষেত্রে এগুলির অভিঘাত বিপুল হতে পারে। যেমন উদাহরণ হিসেবে, ১৯৫৫-৫৬ সালে আলাবামার মন্টগোমারিতে বাস-যাত্রী পরিবহণে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা তুলে দেওয়া এবং ১৯৬০ সালে ন্যাশভিল-এ দুপুরের খাবারের জায়গায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা তুলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলন নিজের শক্তিকে সংহত করে তোলে। ১৯৩০-৩১ সালে লবণ আইন ও অন্যান্য আইনকে কেন্দ্র করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্রিটিশদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় নজর দেয়। একটা সময়ে অর্জন করতে পারলেও এই অভিলক্ষ্যগুলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পুরো দক্ষিণাঞ্চলের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে উলটে দেওয়া কিংবা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের মতো বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনায় সামান্যই ছিল। তবে এগুলির সত্যিকার অভিঘাতটি ছিল স্বয়ং ওই আন্দোলনগুলির উপরই এগুলির অনুঘটনকারী প্রভাবের

মতো। এই সব বিজয়গুলি জনগণকে দেখিয়েছিল যে, তাদের কার্যকলাপগুলিরও গুরুত্ব আছে এবং তারাও একটা ফারাক গড়ে দিতে সমর্থ, আর সেটাই এই সব আন্দোলনগুলির পেছনে সাহায্য-সমর্থন আর সমাবেশকে বিপুল ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এগুলিকে সজোরে ঠেলে দিয়েছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চের ঠিক মাঝখানে।

তবে উন্নত নৈতিক ভিত ধরে রাখতে পারার কারণেই যে কেবল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলনে কিংবা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই অভিলক্ষ্যগুলি অর্জন সম্ভব হয়েছিল তা নয়। সেগুলি অর্জন করা সম্ভব হওয়ার পেছনে কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা আর দক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণও কারণ হিসেবে ছিল। সমস্ত সফল অহিংস কার্যকলাপের ক্ষেত্রেই এই কথাটা সত্য। তবে অনেকেই এই সত্যটি উপেক্ষা করেন এবং তার বদলে তারা ধরে নেন যে, অহিংস কার্যকলাপের মধ্যে আছে মূলত জনতার প্রতিবাদ, তাণ্ডবের বহিঃপ্রকাশ এবং নৈতিক নিষেধাজ্ঞা, বা যেন এর সাফল্য নির্ভর করে কোনো এক আকর্ষণী-নেতার উপর বা কোনো ধরনের চমৎকারী ক্ষমতার উপর। কিন্তু তা নয়। এ-জন্য মতাদর্শগত ভাবে শান্তিবাদ বা নীতিগত অহিংসার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো লোকেরই প্রয়োজন নেই। বরং এ-জন্য যেটা প্রয়োজন তা হল একটি সামুদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা, যা জনগণ, নিপুণ সামগ্রিক-কৌশলগত পরিকল্পনা, কার্যকরী জন-যোগাযোগ এবং অবস্থার সঙ্গে মানানসই যথাযথ পদ্ধতিগুলিকে শনাক্ত করার কাজের ঐক্য ঘটায়। তবে সব রোগীর জন্য যেমন এক পথ্য নয়, তেমনই স্থান-বিশেষে অহিংস কার্যকলাপও ভিন্ন হয়। ক্ষমতা যেমন সম্মতি এবং আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে, তেমনই এটিকে যে নীতি-আদর্শগুলি পরিচালনা করে সেগুলি সব সংগ্রামের ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয় হলেও এটির প্রয়োগ নির্ভর করে নির্দিষ্ট সমাজটিতে এর প্রাসঙ্গিকতা এবং সমাজটির বিশিষ্টতাগুলির উপর। এটি জনতার বলিষ্ঠ কার্যকলাপ হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে, কেনাকাটা করার ধাঁচের সূক্ষ্ম বদল ঘটিয়ে প্রকাশ পেতে পারে, কিংবা দুটিই হতে পারে (অধিকাংশ আন্দোলনেরই নানান বিচিত্র ধরনের সব বিশেষ-কৌশল থাকে, যেগুলিকে এমন ভাবে ছক করা হয় যাতে নানান তলে জড়িত-থাকা জনগণ সেগুলি ব্যবহার করতে পারে।), তবে তা যে-ভাবেই হোক না কেন এটি জনগণের ব্যবহারের জন্য একটি পথ জুগিয়ে দেয় বা

তাদের সমাজের ভিতরে একটি রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করে দেয়, যাতে সেখানে চাপ দিয়ে দৃঢ়-সুরক্ষিত প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে নেওয়া যায়।

সৌভাগ্যক্রমে, বড় ধরনের সফলতা অর্জন করতে অহিংস কার্যকলাপকে জনগণ কী-ভাবে কাজে লাগাতে পারে এবং ঐতিহাসিক ভাবে কী-ভাবে কাজে লাগিয়েছে সে-বিষয়ে প্রচুর মননশীল কাজ, গবেষণা এবং ভাববিনিময় হয়েছে। এই জ্ঞানের চাহিদা তাদের কাছে ক্রমেই বাড়ছে যারা অহিংস কার্যকলাপের ভিতরের ক্ষমতাকে এবং সম্ভাবনা-শক্তিকে স্বীকার করেন। এ-ব্যাপারে আপনি বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই কোনো খবর পাবেন না এবং খুব বেশি রাজনীতিককেও এ-ব্যাপারে কোনো কথা বলতে শুনবেন না। কিন্তু আপনি যদি সারা বিশ্ব জুড়ে তৃণমূল স্তরের সংগঠক এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন, তা হলে তারাই আপনাকে এ-ব্যাপারে বলবেন। তারা স্বীকার করেন, কোনো সমাজে এই জনগণই হল পরিবর্তনের অনুসংগঠক এবং ওই কাঠামোগত পরিবর্তন গড়ে ওঠে নিচের তলা থেকেই। কেউ এক জন তাদের নেতৃত্ব দেবেন সেই প্রতীক্ষায় তারা বসে থাকেন না। কারণ তারা বোঝেন যে, অধিকাংশ সরকারি আর নিগম কর্তাব্যক্তিরা তাদের লোকজন ছিন্নমূল হয়ে গেলে যা করা উচিত সেটা করার জন্য এগিয়ে এসে দাঁড়াবে না, এবং নিজেরা জানেনও না ওদের কৈফিয়তযোগ্য রাখার কী উপায় আছে। কাজেই সারা বিশ্বের জনগণ তাদের মানবিক অধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, নারীদের অধিকার, ভূমিজ জনগণের অধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং পরিবেশগত সুরক্ষা জয় করে নেওয়ার জন্য নিজেদের জনসম্প্রদায়গুলির ক্ষমতায়নের একটি বাস্তবধর্মী উপায় হিসেবে ক্রমেই অহিংস কার্যকলাপের দিকে ঝুঁকছেন (যেটাকে তারা মতদান ব্যবস্থা, আইনি ব্যবস্থা, কিংবা পরিবর্তন ঘটানোর অন্যান্য চিরাচরিত উপায়ের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারেন)। অহিংস কার্যকলাপকে যে অভিলক্ষ্য পূরণের জন্যই ব্যবহার করা হোক না কেন, একই রকম থাকে এর পূর্বশর্ত: জনগণের মনে ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণাটিকে আবার একটা নয়া আধারে সাজানো। এই জ্ঞান বিনিময় করা এবং জনগণকে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করা মানবতার গতিপথ বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক কাজ।

© ২০০৮ হার্ডি মেরিম্যান

*এটি Conservation Biology (Volume 22, No. 2, April 2008 pp. 241-2)-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির সামান্য পরিবর্তিত সংস্করণ।